লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

পরিবেশ উন্নয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ*

১. পরিবেশ ও উন্নয়ন

১.১ ভূমিকা ঃ সমাজে বসবাসকারী জনগণের সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পদের ব্যবহার সরাসরি জড়িত। পৃথিবীতে সম্পদ অফুরন্ত, মানুষ যদিও পূর্বে এ ধারণা লালন করত, কিন্তু তা আজ সর্বজন স্বীকৃত নয়। যুগের সাথে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। ধারণার পরিবর্তন এমনিতে হয়নি বা দু'এক দিনে আসেনি। মানুষ যখন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখনি তার কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস চালায় এবং এক পর্যায়ে মূল কারণ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়।

মানুষ দু'ধরনের সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করে থাকে– একটি পুনরাভর (Renewable resources) সম্পদ এবং অপরটি অপুনরাভর (Non-renewable resources) সম্পদ। কেউ সম্পদ ব্যবহার করে থাকে মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য; আর কেউ বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। কিন্তু সম্পদ ব্যবহারের দৃষ্টিভংগি সবার একই রকম–সম্পদ অপরিসীম। আজ মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করছে যে, পৃথিবীর সম্পদ অফুরন্ত নয়। সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার পৃথিবীতে সম্পদকে শুধু দুর্লভ করে তোলেনি, সৃষ্টি করেছে নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যা। ১৯৯২ সনের জুন মাসে ব্রাজিলের রিওডিজেনারিওতে অনুষ্ঠিত "পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ধরিত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে স্বীকার করেছেন, উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য টেকসই উন্নযন (Sustainable Development) পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। তবেই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবেশ–এর জন্য ক্ষতিকর হবে না।

১.২ উন্নয়ন ঃ সমাজে বসবাসকারী জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং সুযোগের সমতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চয়তা বিধান উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্য। অর্থনেতিক উন্নয়ন উন্নয়নের একটি আবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু অর্থনেতিক উন্নয়ন সার্বিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়না।

শিক্ষার সুযোগ, শিশুমৃত্যু ও পুষ্টির মাত্রা জিডিপি এবং জিএনপি'র অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কেউ কেউ এ সূচকগুলোকে

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

উন্নয়ন–এর সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে। ইউএনডিপি–এর মানব উন্নয়ন সূচক সমূহ তারই ফল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

পরিবেশ অবক্ষয় শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর তাই নয়, বরং তা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সমান বা অধিক হারে ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিরমান সহ গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ড ধ্বংস করে দিচ্ছে এ পৃথিবীর পরিবেশকে। বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে এ প্রজন্মের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমনিভাবে দূষিত পরিবেশের ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের দরিদ্র জনগোষ্ঠীও উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং দূষিত পরিবেশ। আর তা প্রতিরোধ করা সম্ভব একমাত্র টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

১.৩ টেকসই উন্নয়ন ঃ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে সেই উন্নয়ন, যার ফলাফল দীর্ঘায়িত হয় অর্থাৎ আজকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফল যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনযাপনের জন্য ক্ষতিকর না হয়। অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার না করে পৃথিবীতে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া যে উন্নয়ন, তাই টেকসই উন্নয়ন। Brunt-Lund কমিশন এর অর্থাৎ World Commission on Environment and Development (WCED)-এর প্রতিবেদন Our Common Future, 1987- এ সর্বজন স্বীকৃত টেকসই উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"Current generations should meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

১.৩.১ টেকসই উন্নয়নের কৌশল জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্ম এক ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার। বেশীর ভাগ দেশ, তার জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার মান অর্জনে সমর্থ হয়নি। এ কারণে এ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থাৎ মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আজকের বিশ্বের জনগণের সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা তাদের পুত্র, প্রৌপুত্র এবং দৌহিত্রের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজ্য।

১.৩.১.১ ধনাত্মক সম্পর্ক স্থাপন ঃ প্রবৃদ্ধির নীতি ত্বরান্বিত করে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ভাল বাজার ব্যবস্থা, যা পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আয় বৃদ্ধি পেলে পরিবেশ উন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব। দারিদ্র দূরীকরণের ফলপ্রসূ নীতিমালা জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়ক এবং তা সম্পদ ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৩.১.২ ঋণাত্মক সম্পর্ক ছিন্নকরণ ঃ আয়বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। সাধারণত অতিরিক্ত উৎসাহমূলক কর্মকান্ড পরিবেশের সত্যিকার মূল্যকে যেনো গ্রাস করতে না পারে, সেজন্য আবশ্যক অতিশয় কম ক্ষতিকর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন। তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবোপযোগী ও ফলপ্রসূ পরিবেশ নীতি এবং নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

১.৩.১.৩ অনিশ্চিত সম্পর্কের শ্রেণী বিভাজন এবং ব্যবস্থাপনা ঃ মানুষের কর্মকান্ডের সাথে পরিবেশ দূষণের সম্পর্ক অদ্যাবধি স্বচ্ছ নয় অর্থাৎ সহজে বোধগম্য

নয়। পবিবেশ দূষণের নিত্য নতুন প্রকৃতি ও বীভৎসতায় সচেতন সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়তই চমকে উঠতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন সাবধানতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন – Safe Minimum standard, অনিশ্চয়তার ঝুঁকি কোথায় বেশি এবং কোথায় অপরিবর্তনীয় ক্ষতির আশংকা বেশি অথবা দীর্ঘ মেয়াদে বেশি মূল্য দিতে হবে– এ বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ ও তার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

১.৪ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরিবেশ ও উন্নয়ন ঃ পৃথিবীর শতকরা ২০ ভাগ জনগণ বসবাস করছে উন্নত দেশসমূহে এবং শতকরা ৮০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশসমূহে। কিন্তু, উন্নত দেশগুলো পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে; অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। সম্পদের এ অসম বন্টন দরিদ্র দেশের জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে আরও দরিদ্র, অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্প বিপ্লবের সময় পশ্চিমা দেশসমূহ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে। শিল্প বিপ্লবের সময় উত্তর আমেরিকা (USA) এককভাবে ভোগ করেছে পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ পেট্রোলিয়াম, যদিও সে পেট্রোলিয়াম আসত উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে। পশ্চিমা দেশসমূহ উজাড় করেছে ক্রান্তীয় বনভূমি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকাসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের বনোজাড়ের জন্য মূলতঃ পশ্চিমা দেশগুলোই দায়ী।

দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ, পানি দূষণ সহ শব্দ দূষণের শিকার হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ। অতিরিক্ত শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণের বিষয়টি অনস্বীকার্য। যুক্ত রাজ্যের লন্ডনে অম্লবৃষ্টি (acid rain), যা হয়েছিল বায়ুতে অতিরিক্ত সালফার–ডাই–অক্সাইড (SO_2) গ্যাস জমার কারণে। বায়ুর পানির সংস্পর্শে এসে এ গ্যাস সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এ পরিণত হয়ে বৃষ্টির মত পড়েছে, যার ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপূরণীয়। অম্লবৃষ্টির ফলে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গাছপালা, পশুপাখি, দালান–কোটা এবং বিভিন্ন প্রাণি। অপরদিকে উত্তর আমেরিকায় শিল্পায়নের পাশাপাশি অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম চালিত যানবাহন পরিচালনার ফলে লস্এঞ্জেলেসের আকাশে বায়ুতে নাইট্রোজেন –ডাই–অক্সাইড (NO_2) গ্যাস জমা হতে থাকে। নাইট্রোজেন–ডাই–অক্সাইড বায়ুমন্ডলের পানির সংস্পর্শে এসে নাইট্রিক এসিডে (HNO_3) রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির আকারে মাটিতে নেমে আসে। তার ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, দালানকোটা এবং নানাবিধ প্রাণি।

উন্নত দেশসমূহের দ্রুত শিল্পায়ন, অতিরিক্ত ও যথেচ্ছ সম্পদ ব্যবহারের ফলে সেখানকার মাটি এবং পানি সম্পূর্ণভাবে দুষিত হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত সি–এফ–সি (CFC) ব্যবহারের ফলে ওজোন স্তর ছিদ্র হওয়ার বিষয়টি উন্নত দেশসমূহ ১৯৮৫ সনে অস্বীকার করলেও ১৯৮৭ সনে যখন উত্তর মেরুতে ওজোন স্তরে ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়, তখন বিষয়টি সবার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠে। তেমনি ভাবে গ্রীন হাউজ প্রভাবের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এসব কিছুর জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহ পরিবেশের এসকল ক্ষতির শিকার হচ্ছে, কারণ পরিবেশ দূষণ কোনো ভূসীমানা মানে না। ইউরোপ এবং আমেরিকা গ্রীনহাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী,

কিন্তু গ্রীনহাউজ প্রভাবের ক্ষতির প্রধান শিকার হবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারাবিয়ান
২ দেশসমূহ। অনুমান করা হচ্ছে, যদি ২০৫০ সনের দিকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩ (তিন) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে বংগোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১ মিটার, এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭.৫ ভাগ এলাকা পানির নীচে ডুবে যাবে। মালদ্বীপ এবং ক্যারাবিয়ান দেশসমূহ পানির নীচে চলে যেতে পারে। ভারতের কিয়দংশ এলাকাও পানিতে নিমজ্জিত হতে পারে।

সরাসরিভাবে বলা যায়, পরিবেশ দূষণে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভূমিকা খুবই নগণ্য, কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশসমূহের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ দূষণ হ্রাস তথা পরিবেশ সংরক্ষণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারা সরকারকে বাধ্য করছে পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রশংসনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বস্তুত উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিবেশগত সমস্যার চেয়ে অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য মৌলিক সমস্যা (দারিদ্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য) রয়েছে; সঙ্গত কারণেই সেগুলো মেটানোর দিকে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হয়।

১৯৯২ সনের জুন মাসে ব্রাজিলের রিওডিজেনারিওতে "পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ধরিত্রী সম্মেলনে এনজিওদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। লাগামহীন উন্নয়ন পদ্ধতি পরিবেশকে ধ্বংস করছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে উন্নয়নের একটি বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনের তথা টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উন্নত দেশসমূহের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশবাদী দলসমূহ দাবী জানিয়েছে এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

২.০ পরিবেশ আন্দোলন

সমাজের অপরাপর সমস্যাবলীর ন্যায় পরিবেশ সমস্যা আজকের বিশ্বে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে রূপ নিয়েছে। সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক সংগঠন। সংগঠন ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হতে পারেনা। সংগঠনসমূহ হতে পারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্যোগে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যুবসংগঠন, মহিলা সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠন ইত্যাদি। পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সংগঠন যে আন্দোলন করে থাকে, তা–ই পরিবেশ আন্দোলন।

বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণে যে সংগঠন সমূহ কাজ করে থাকে, তারমধ্যে ৪টি সংগঠনের নাম প্রণিধানযোগ্যঃ

২.১ সংরক্ষণবাদী
২.২ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী
২.৩ বিকল্প জীবন যাপন ও কৃষ্টি সংরক্ষণ
২.৪ সবুজ দল

২.১ সংরক্ষণবাদী (Conservationists)

১৯ শতকের দিকে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে কিছু সংখ্যক জনগণ একত্র হয়ে বিলুপ্ত প্রায় বা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে, এ ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের মাধ্যমে

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দল গঠন করে, তারাই সংরক্ষণবাদী নামে পরিচিত। যে সকল প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, সে সকল বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে তারা উৎসাহী (উদাহরণ – Sierra club)। বস্তুত এটি একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ। তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে চাপ সৃষ্টি করতে অনাগ্রহী। তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বাসী।

২.২ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Activists)

সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দল ১৯৬০ এর দশকে সারা বিশ্বে একযোগে কাজ শুরু করে এবং তারা সক্রিয় কার্যকরী দল বলেও অভিহিত। সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং সরকারকে নীতি নির্ধারণে চাপ সৃষ্টি করে। Green Peace তার একটি উদাহরণ। Green Peace একটি বহুজাতীয় কোম্পানীর ন্যায় বিভিন্ন মহাদেশে কাজ করছে। তাদের প্রধান কার্য্যালয় বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রীণপিস–এর প্রধান কার্যালয় এক জায়গায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রীণপিস এর প্রধান কার্যালয় একই স্থানে আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা অনেক। একটি বিশেষ পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ৭/৮ সপ্তাহের জন্য একটি দল গঠিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে, সে সংগঠন আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়।

২.৩ বিকল্প জীবন–যাপন ও কৃষ্টি সংরক্ষণ (Alternative life style sub-culture)

এ দলটি বিভিন্নমুখী বা বিভিন্ন মতবাদের দলের সমন্বয়ে গঠিত। তারা অত্যাধুনিক পশ্চিমা জীবন যাপন পদ্ধতির চেয়ে সাধারণ জীবন যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, যা পরিবেশের জন্য কল্যাণকামী। কোনো কোনো দল রাজনীতি বা সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ Biological farming, healthy life style & age group)। ভারতের মহাত্মা গান্ধীর জীবন যাত্রা এবং তার মতবাদ পরিবেশ বন্ধুসুলভ। ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী আমেরিকাতে অত্যধিক প্রশংসিত, কারণ তাদের জীবন যাত্রা পরিবেশ বন্ধুসূলভ; যদিও তা অত্যন্ত পুরনো জীবন যাপন পদ্ধতি। এ দলটি নিজের জীবনে অনুসরণ করে অন্যদের দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায়, পরিবেশ বন্ধুসূলভ জীবন যাপন সম্ভব।

২.৪ সবুজ দল (Green parties)

পরিবেশ বিষয়ক এ আন্দোলনটি অত্যন্ত আধুনিক আন্দোলন এবং এটি একটি রাজনৈতিক দল। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে সবুজ দল প্রাদেশিক সরকারে, এবং কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আছে। তারা সরাসরি ক্ষমতায় থেকে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৩.০ বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি সমাজের সচেতন গোষ্ঠীর হৃদয়কে এখনো নাড়া দিতে পারেনি। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞানের অভাব বা পরিবেশ সচেতনতার অভাব। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সনে পরিবেশ সংরক্ষণের

জন্য তথা পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন করে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত করে বাংলাদেশের আংগিকে সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাবে তার সঠিক সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, যিনি যে বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ তিনি সে বিষয়ের উপর কাজ করছেন না বা করতে পারছেন না বিধায় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

আজকের বিশ্বে পরিবেশ বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচিত। তার সূত্র ধরে সমাজের সুযোগ সন্ধানীরা, যাদের পরিবেশ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই বললে চলে, তারা নিজেদেরকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করছে। আর্থিক সুবিধা লাভ এবং বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বস্তুত তারাই মন্ত্রণালয়ে বা নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রভাব খাটাচ্ছে। পরিবেশ বিষয়ের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের বিষয়টির উপর এ পর্যায়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোনো সরকার "গ্রীন হাউজ প্রভাব"–এর উপর প্রশিক্ষণ বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দু'জন/একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এমন একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হলো, যার "গ্রীন হাউজ প্রভাব" বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে কর্মকর্তা বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং দেশের প্রতিবেদন (Country Paper) সেমিনারে উপস্থাপন করবেন। যিনি মূল বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করার মত জ্ঞান রাখেন না; তিনি কি করে Country paper প্রণয়ন করবেন এবং বিদেশে সেমিনারে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন, এটি প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। মনোনীত কর্মকর্তা বিদেশীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না; বিদেশ থেকে লব্ধ জ্ঞান দেশে এসে কাজে লাগানোর বিষয়টি তো প্রশ্নই আসে না। তাই প্রয়োজন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করা। তবেই তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। নচেৎ অতীতের ন্যায় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে দেশের ভবিষ্যত অপ্রত্যাশিত পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি কঠোর দৃষ্টি দিলে তবেই পরিবেশ সংরক্ষণে মঙ্গলকর কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব। তার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়িত না হলে যে কোনো উন্নয়ন বিঘ্নিত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। পরিবেশ দূষণ সমস্যা শুধু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক পদ্ধতি যৌথভাবে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে পরিবেশ দূষণ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বনঅধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর আলাদাভাবে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়সহ গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণা পরিচালনার জন্য জনবল কর্মরত থাকলেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, কেমিক্যালস ইত্যাদির অপ্রতুলতার কারণে সত্যিকার অর্থে পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থও অপ্রতুল। পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করলেও তার জন্য বাজেট না থাকায় বা দাতা সংস্থা পাওয়া না যাওয়ায়, সে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত বৈজ্ঞানিকরা এক পর্যায়ে তাদের

প্রতিভা কাজে লাগাতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তায় দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ক্ষতিকর পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকারী এবং দাতা সংস্থায় সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৩.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বিদেশি এবং দেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মেলানোর জন্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উদার বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে দ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের পরিবেশকে ধ্বংস করছে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সাবধানতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

৩.২ বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলন

বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যা, দারিদ্র, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সমস্যাসহ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় জর্জরিত। দু'শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ঔপনিবেশ ছিল। ১৯৭১ সালে ৯ মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ উন্নীত হয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং খরার ন্যায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতাও দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে পিছিয়ে দিয়েছে ব্যাপকভাবে।। জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে, যা দেশের ধারণ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের পক্ষে এককভাবে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমাজবিজ্ঞানী Inglehart তার এক hypothesis এ বলেন– "People tends to high priority whatever the needs are in short supply. When the physiological and physical safety at minimum level then people shifts towards non-materialistic needs." বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি এখনো, তাই এ পর্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে অবস্তুতাত্ত্বিক মূল্যবোধ (Post materialistic Values) আশা করা অপ্রত্যাশিত। যদিও কিছু কিছু মানুষ সমাজতান্ত্রিক দল বা কমিউনিষ্ট দল করে থাকে, তাদেরকে বলা যায় ব্যতিক্রমধর্মী, যা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দেখা যায়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। ইউরোপের ন্যায় বাংলাদেশে পরিবেশের উপর কাজ করছে এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেনি অর্থাৎ Green Peace এবং Green Parties-এর ন্যায় সংগঠন অবর্তমান। তবে বাংলাদেশে খুবই সীমিত আকারে পরিবেশের উপর কয়েকটি সংগঠন কাজ করছে। এ সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের উপর নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণ বন উজাড় করেছে ব্যাপক হারে, যা আমাদের কাছে আজ একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দাড়িয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে প্রতি বৎসর সাইক্লোন উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা

বেড়েই চলছে। ১৯৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল–এ সংঘটিত সাইক্লোনের ধ্বংসলীলায় উপকূলীয় অঞ্চলকে কালপুরীতে পরিণত করে দিয়েছিল। ১ লক্ষ ৩০ হাজার জীবন নাশসহ যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, তা এখনো সবাইকে আঁৎকে দেয়। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে উকূলীয় বন উজাড় হওয়ার পথে। বাণিজ্যিক উপায়ে চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাও উপকূলীয় বনকে ধ্বংস করছে। উপকূলীয় বন উজাড়ের ফলে সাইক্লোন সরাসরি আঘাত হানছে এবং ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এবং জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে, এ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য যৌথ উদ্যোগে বনায়ন অত্যাবশ্যক। দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বনবিভাগ বনায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও (NGO) সীমিত আকারে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে দুটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Activits) সংস্থা কাজ করছে এবং তারা রাজনীতিসহ সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর একটি হলো Bangladesh Environmental Journalist Forum (BEJF)। এবং অপরটি Bangladesh Environmental Lawyer Association (BELA)। বাংলাদেশে কখনো কখনো সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দল গঠিত হয় একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশ জনিত সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সমাধানের পর তা আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হাজারীবাগ টেনারী এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য Hazaribag Tannery Area Action Committee গঠিত হয়েছিল, তাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য। BEFJ এবং BELA পরিবেশগত কোনো বিশেষ সমস্যার বিষয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি সরকারের গোচরে নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তবে ইউরোপ এবং আমেরিকার Activists জাতীয় সংস্থাগুলোর ন্যায় BEJF এবং BELA তেমন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে না।

দেশে পরিবেশ সংরক্ষণে সীমিত আকারে আনুমানিক ৪০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) কাজ করছে। তবে উন্নত দেশ সমূহের ন্যায় তারা রাজনীতি এবং সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না। বস্তুত তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বড় আকারের কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে পারছে না। বাংলাদেশে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক এবং আগ্রহী জনগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবেশের উপর কাজ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে তারা তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। অপরদিকে আর্থিক সংস্থান না থাকায়ও তারা এক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সরকারের প্রকল্প, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরসহ অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের পরিবেশের উপর কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ দূষণ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতা সংস্থা সমূহের একক তহবিলে বন বিভাগ ১৯৯৫–৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণ, উদ্যান উন্নয়ন, বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

১৯৮৯ সালে "পরিবেশ অধিদপ্তর" এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম "পরিবেশ নীতি ও এ্যাকশান প্লান" প্রণয়ন করা হয়।

ব্রাজিলের রিওডি জেনারিও-তে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হয় "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED); যা Earth Summit নামে পরিচিত। পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত সম্মেলনের প্রধান ফসল এজেন্ডা-২১। ধরিত্রী সম্মেলনে দু'টো আন্তর্জাতিক কনভেনশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একটি "United Nations Framework Convention on Climate Change" এবং অপরটি "Convention on Bio-Diversity"। তাছাড়াও পরিবেশের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশে যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকরি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে দেখা যেতে পারেঃ

- Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,
- Basel Convention on the control of Transboundary movement of Hazardous Wastes
- International Convention to combat Desertification,

উপরোক্ত চুক্তিসমূহ ব্যতিরেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরো যে দুটি চুক্তির বাস্তবায়ন চলছে তা হলো–

- Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR)
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),

এছাড়া সমুদ্র পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল চুক্তির সাতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে সম্পৃক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- United Nations Convention on the Law of the Sea.
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত ২২টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় আন্তর্জাতিক চুক্তি ও এগুলো বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১) Agenda- 21

Agenda-21 কোন চুক্তিবদ্ধ দলিল নয়। এতে ৯০ দশক ও একবিংশ শতকে বিশ্বের দেশ সমূহে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করণের বিষয়ে কৌশল ও সমন্বিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহ তাদের নিজস্ব এজেন্ডা তৈরি করার কথা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জাতীয়

এজেন্ডা–২১ তৈরির জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও অর্থায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে।

সম্প্রতি UNDP-এর সহায়তায় "National Environment Management Action Plan" (NEMAP) প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে জাতীয় এজেন্ডা –২১ এর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত National Conservation Strategy (NCS)-এর সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রমেও এজেন্ডা–২১ প্রতিফলিত হয়েছে।

২) "Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer" Montreal - 1987.

বিশ্বব্যাপী ওজোনস্তর ধ্বংসকারী দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার রোধকল্পে ১৯৮৭ সালে গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ এর লন্ডন এমেন্ডমেন্ট (১৯৯০) অনুস্বাক্ষর করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রটোকলের আওতায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বছরওয়ারী আমদানি ও ব্যবহারের পরিমাণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রটোকলের আওতায় গঠিত মান্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় একটি স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি Reconnaissance Study এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে Country Programme for Phasing out the use of Ozone Depleting Substances শীর্ষক একটি বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন করেছে।

উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকার নীতিগত অনুমোদন করেছেন। কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় প্রস্তাবিত ৪ (চার)টি প্রকল্পের মধ্যে "মন্ট্রিল প্রটোকল মান্টিলেটারেল ফান্ড" (এম, এল, এফ) অর্থায়নে ৬৫.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Institutional Strengthening for the Phase out of Ozone Depleting Substances" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে "ওজন সেল" গঠন করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩) United Nations Framework Convention on Climate Change, Rio-de-Janeiro 1992.

এ চুক্তি বাস্তবায়ন কল্পে দেশে ইতোমধ্যে মোট ৯৯.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

৪) Convention on Bio-Diversity, Rio-de-Janeiro, 1992.

এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে "Development of Integrated Coastal Zone Management Strategy for Maintenanee of Marine Water Quality and Bio-diversity" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য Activity Initiation Brief (AIB) প্রস্তুত করেছে। উক্ত AIB এর ভিত্তিতে প্রকল্প দলিল তৈরি কল্পে PRIF সমীক্ষা প্রকল্পের প্রস্তাবনা বর্তমানে GEF কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া IUCN এর আর্থিক সহায়তায় NCS Implementation Project-1 শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে "Inventory of Flora and Fauna" এবং Ecosystem Maping এর কাজ চলছে।

৫। Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal, Basel 1989.

এ চুক্তি বাস্তবায়নের ইতোমধ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বাংলাদেশে বর্জ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "দেশে ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো প্রণয়নের জন্য উপদেষ্টামূলক কারিগরী সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি বছর জুন মাস নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।।

৬) RAMSAR Convention

যে সকল Wetland হুমকির সম্মুখীন তা রক্ষা করাই এ চুক্তির উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবনকে RAMSAR-এর কার্যক্রম ভুক্ত করা হয়েছে।

৭) CITES

এ চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে ইতোমধ্যে দেশে বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন জারী করা হয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তরকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য Wildlife Advisory Board গঠিত হয়েছে।

৪. উপসংহার

বাংলাদেশ আর দশটি উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অপরাপর সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের তথা পরিবেশ সংরক্ষণের যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়। সরকারের পক্ষে এককভাবে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়া কখনই সম্ভব নয়। সরকার এবং জনগণ যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করলে তবেই তা স্বার্থকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এজন্য জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশের গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে গণমাধ্যমসমূহ ইতোমধ্যে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার ও জনগণের কার্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উপরও সমভাবে বর্তায়। কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আশার বাণী না শুনিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্রত হওয়ার জন্য আসুন আমরা একতাবদ্ধ হই, বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি দুষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. World Development Report, 1992, World Bank Washington D. C. U. S. A.

২. Effect of Climate Change and Sea-level rise on Bangladesh. Dr. F. U. Mahtab. July, 1989.

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশের পরিবেশ, এম মনিরুল কাদের, মির্জা এফ সুব্রত পাল, সেন্টার এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিচার্স (সিইএম আর) ৬৮/১, পুরানো পল্টন, জিপিও বক্স, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৪. Hartjen C. A. 1977, Possible Trouble : an Analysis of Social Problems, Pracger Publishers, NewYork,

৫. Inglehart, R. Selections.

৬. Howard S. Becker, Social Problems: A modern Approach (New York: Wiley, 1966).

৭. Ministry of Environment and Forest, Government of the peoples Republic of Bangladesh. National Environment Management Action Plan (NEMAP). Volume 11: Main Report, (1995).

৮. Ministry of Environment and Forest, Government of the peoples Republic of Bangladesh. National Environment Management Action Plan (NEMAP) Volume la: Summary (1995)

৯. Ministry of Environment and Forest, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, October, 1991. Bangladesh Country Report For United Nations Confernece on Environment and Development (UNCED). Brazil, 1992.

১০. পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment), বিশ্বপরিবেশ দিবস (World Environment day, June 5, 1995) : আমরা বিশ্ববাসী: বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ (We the peoples: United for the Global Environment).

১১. Department of Environment, Ministry of Environment and Forest, August 1991. Department of Environment - A Brief.

১২. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫.

১৩. পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়নকার্যক্রম।

১৪. পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অংগীকার সমূহ ও উহাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।